২৫

তারিখ 05 MAY 1996
পৃষ্ঠা ২ ... কলাম ৫

দৈঃ জনকণ্ঠ

সরকারী প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে কোটি কোটি টাকা লুটপাটের জন্য নিয়ম বদলে দেয়া হলো

রেজা রায়হান

সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের সুযোগে বিএনপির মন্ত্রী, এমপি ও নেতারা [illegible] বছরে অন্তত ৩৫ কোটি টাকা অবৈধভাবে উপার্জন করেছেন। দুর্নীতি ও দলীয়করণের [illegible] সৃষ্টি করার জন্যই বিধি বহির্ভূতভাবে জেলা প্রশা[illegible]র নেতৃত্বে ইন্টারভিউ বোর্ড গঠন করা হয়। ক্ষমতাসীন বিএনপির প্রভাবিত ইন্টারভিউ বোর্ডের হাতে ৫০ নম্বর থাকায় ইচ্ছামতো পছন্দের প্রার্থীদের নিয়োগ দেয়া সম্ভব হয়। পূর্বের মতো কেবলমাত্র লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র

দুর্নীতির রাহুগ্রাস

কম্পিউটারের মাধ্যমে মূল্যায়ন করেই যদি মেধার ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগ করা হতো তাহলে এভাবে দুর্নীতি ও দলীয়করণ করা সম্ভব হতো না।

'৯৩ থেকে '৯৫ সাল পর্যন্ত যে ১৭ হাজার ১শ' ৭৭ জন প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষক ইন্টারভিউ বোর্ডের মাধ্যমে নিযুক্ত হয়েছেন তার তিনগুণ প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষা নেয়া হয়। যদি ধরে নেয়া হয় যে, নিয়োগ লাভকারী শিক্ষকরাই কেবল মন্ত্রী, এমপি ও বিএনপির নেতাদের মৌখিক পরীক্ষায় বেশি নম্বর পেয়ে চাকরি লাভের জন্য ২০ হাজার টাকা করে 'নজরানা' দিয়েছেন তাহলে এদের উপার্জনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৫ কোটি টাকা। আর তিনগুণ প্রার্থীর মধ্যে যদি অন্তত দ্বিগুণ প্রার্থীও ২০ হাজার টাকা কিংবা ৩০ হাজার টাকা করে 'নজরানা' দিয়ে থাকে তাহলে এদের অবৈধ উপার্জনের পরিমাণ ১শ' কোটি টাকায় উন্নীত হওয়া অসম্ভব নয়।

শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি ও দলীয়করণ বিএনপি নেতাদের কাছে যে কোন নিন্দনীয় ব্যাপার ছিল না তার প্রমাণ কৃষি এবং সেচমন্ত্রী মজিদ উল হকের একটি চিঠি। '৯১ সালের ১৫ জুন ১৫ জনের একটি টাইপ করা তালিকা থেকে মন্ত্রী মাগুরা বালিকা বিদ্যালয়ে ৬টি ও বালক বিদ্যালয়ে ৮টি শূন্য পদে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ১৪ জনকে নিয়োগ দেয়ার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দেন। মন্ত্রী ঐ টাইপ করা নামের তালিকার পাশে লেখেন ঃ "এই প্রার্থীরাও খুলনায় ইন্টারভিউ দিয়েছিলেন কিন্তু যাঁরা এ পর্যন্ত মনোনীত হয়েছেন তাঁরা কেউই আমাদের সমর্থিত প্রার্থী নয়।

(২-এর পাতায় দেখুন)

সরকারী প্রাথমিক

(প্রথম পাতার পর)

যেহেতু জেলা ভিত্তিক কোটায় নিয়োগ করা হবে তাই আমার অনুরোধ এই তালিকার প্রথম ১৪ জন অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হ'ক।"

সরকারী উক্ত [illegible] এভাবে সরাসরি বিএনপির 'আমাদের সমর্থিত প্রার্থী'দের শিক্ষক নিয়োগ সম্ভব না হলেও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে তা ১শ' ভাগ সম্ভব হয়েছে। এজন্যই গঠন করা হয় জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে মৌখিক পরীক্ষার জন্য 'ইন্টারভিউ বোর্ড' (এ সম্পর্কে বিস্তারিত ২৮ এপ্রিলের জনকণ্ঠে "৫ মাসেও প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হলো না" শীর্ষক প্রতিবেদনে দেখুন)।

এরশাদ আমলে উপজেলা পরিষদকে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগের দায়িত্ব দেয়া হয়। কিন্তু এ পদ্ধতিতে ব্যাপক দুর্নীতির কারণে এরশাদ শাসনের শেষ দিকে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মাধ্যমে কেন্দ্রীয়ভাবে পরীক্ষা গ্রহণ করে শিক্ষক নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সে সময় নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের মাধ্যমে '৯০ সালে শিক্ষক নিয়োগের জন্য যে বাছাই পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় তার উত্তরপত্র কম্পিউটারের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয়। ফলে ঐ সময় শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠেনি। সে সময় প্রায় ৯ হাজার সহকারী শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য এরশাদ শাসনের শেষ দিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি বিধিমালা তৈরির উদ্যোগ নেয়! এ জন্য প্রয়োজনীয় কাজ সে সময় সমাপ্ত না হওয়ায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শাসনামলে ১৯৯১ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি 'সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৯১' বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

এ বিধিমালা প্রবর্তনের পর ১৯৯২ সালে ৩ পার্বত্য জেলা বাদে ৬১টি জেলায় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষক নিয়োগের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হয়। কেন্দ্রীয়ভাবে প্রশ্নপত্র তৈরি এবং একই তারিখে সারা দেশে জেলা পর্যায়ে বাছাই পরীক্ষার মাধ্যমে থানাভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগের প্যানেল তৈরির জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ '৯৩ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি 'কেন্দ্রীয় প্রাথমিক শিক্ষক নির্বাচন কমিটি' গঠন করে। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগ বিধিমালা অনুযায়ী গঠিত এ নির্বাচন কমিটিতে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালককে চেয়ারম্যান, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার মহাপরিচালক, ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান, ঢাকা মহানগরীর সরকারী কলেজের একজন অধ্যক্ষ, সরকারী কর্মকমিশন, সংস্থাপন মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের একজন প্রতিনিধিকে সদস্য রাখা হয়।

কমিটি ১শ' নম্বরের ভিত্তিতে [illegible] দেশব্যাপী গ্রহণ করে তা[illegible] উত্তরপত্র কম্পিউটারের মাধ্যমে মূল্যায়নরত অবস্থায় '৯৩-এর ৮ মে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ নিয়োগ বিধিমালা লঙ্ঘন করে এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে। এতে কেবলমাত্র লিখিত পরীক্ষার কথা থাকলেও প্রধান শিক্ষক এবং সহকারী শিক্ষকের বাছাই পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেধাক্রম অনুসারে প্রত্যেক থানার শূন্যপদের বিপরীতে ৩ জন করে প্রার্থী এবং তাদের নামের পাশে প্রাপ্ত নম্বর উল্লেখ করে একটি তালিকা জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে মৌখিক পরীক্ষার জন্য নবগঠিত ইন্টারভিউ বোর্ডের কাছে পাঠাতে বলা হয়। ঐ ইন্টারভিউ বোর্ডের অন্য সদস্য হলেন স্থানীয় সরকারী কলেজ অথবা স্কুলের শিক্ষকদের মধ্য থেকে মনোনীত একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার হন সদস্য সচিব।

আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, ইতোপূর্বে নিয়োগ বিধির অধীনে যে কেন্দ্রীয় শিক্ষক নির্বাচন কমিটি এক শ' নম্বরের পরীক্ষা নিয়েছে তার নম্বর হ্রাস করে ৫০ নম্বর করা হয় এবং বিধিবহির্ভূত মৌখিক পরীক্ষার নম্বর ৫০ রাখা হয়। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের তদানীন্তন সচিব (বর্তমানেও তিনিই সচিব) এবং তদানীন্তন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালকসহ সংশ্লিষ্টদের কেউই বিধিবহির্ভূতভাবে ইন্টারভিউ বোর্ড গঠনের পক্ষে ছিলেন না। প্রাথমিক শিক্ষকদেরকে দলীয়করণ ও শিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে বিএনপি'র মন্ত্রী, এমপি ও দলীয় লোকদেরকে টাকা কামানোর উপায় করে দেবার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এ সিদ্ধান্ত নেয়। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ তখন প্রধানমন্ত্রীর অধীনে ছিল। ঐ সময় প্রধানমন্ত্রীর সচিব হিসাবে যিনি কর্মরত ছিলেন, তাঁকেই মনে করা হয় এ ইন্টারভিউ বোর্ডের স্বপ্নদ্রষ্টা। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভাল বেতনের লোভনীয় চাকরি পাবার জন্য শূন্যপদের যে তিনগুণ প্রার্থী মৌখিক পরীক্ষার জন্য ইন্টারভিউ কার্ড পেয়েছেন [illegible] প্রায় সকলেই বিভিন্ন চ্যানেলে বিএনপির মন্ত্রী, এমপি [illegible] নেতাদের শরণাপন্ন হয়েছেন। ধরে নেয়া যায়, চাকরি পাবার জন্য ২০/৩০ হাজার টাকা নজরানা দিতে কারোরই আপত্তি ছিল না। প্রায় সকলেই তা দিয়েছেন। হয়তো অনেকের টাকাই যথাস্থানে না পৌঁছে [illegible]উটদের পকেটে গেছে। কারণ সংরক্ষিত

কোটার কারণে ৬০ শতাংশ শূন্যপদে মহিলা নিযুক্ত করতে হবে। বাকি ৪০ শতাংশের মধ্যে ২০ শতাংশ পোষ্য কোটা। এরমধ্যে ১০ শতাংশ মহিলা হওয়াই স্বাভাবিক। বাকি ২০ শতাংশ পুরুষ প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত হওয়ায় ৭০ শতাংশ মহিলা সাক্ষাতকার প্রদানকারীদেরকে আর্থিক ও অন্যান্য হয়রানির শিকার হতে হয়েছে। নিয়োগবিধি অনুযায়ী শুধুমাত্র গৃহীত ১শ' নম্বরের লিখিত পরীক্ষার কম্পিউটারে মূল্যায়িত মেধা তালিকা অনুসারে থানাভিত্তিক নিয়োগের প্যানেল তৈরি করা হলে বিপুলসংখ্যক মহিলা ও পুরুষ প্রার্থী সীমাহীন নিগ্রহ, হয়রানি ও দলীয় লোকদের নজরানা দানের বিড়ম্বনা এড়াতে সক্ষম হতেন।

'৯৩ সালে ইন্টারভিউ বোর্ডের চেয়ারম্যান নোয়াখালীর জেলা প্রশাসক সেখানকার মন্ত্রী, এমপি ও দলীয় লোকদের তদ্বির রাখতে অস্বীকার করায় রাতারাতি তাকে বদলি করে নতুন জেলা প্রশাসক নিয়োগ করে ইন্টারভিউতে নিজেদের লোকদের চাকরির ব্যবস্থা করা হয়। তদানীন্তন ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও যশোরের জেলা প্রশাসকও কথা শোনেননি বলে তাদেরকে বদলি করা হয়।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের পরিসংখ্যান অনুসারে ১৯৯৩ সাল থেকে '৯৫ সাল পর্যন্ত ৪ দফায় ৩৭ শ' ৪জন প্রধান শিক্ষক এবং একই সময়ে ৫ দফায় ১৩ হাজার ৪শ' ৭৩ জন সহকারী শিক্ষককে সাক্ষাতকারের মাধ্যমে নিয়োগ করা হয়েছে। মোট ১৭ হাজার ১শ'৭৭ জন প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। এছাড়া আরও প্রায় ৪ হাজার সহকারী শিক্ষকের শূন্যপদ পূরণের জন্য গত ডিসেম্বরে লিখিত পরীক্ষা নেয়া হয়েছে। যদি সাক্ষাতকার ছাড়াই লিখিত পরীক্ষার কম্পিউটারে মূল্যায়িত ফলাফলের ভিত্তিতে মেধাক্রম অনুসারে শিক্ষক নিয়োগ করা হয় তাহলে তা এ ক্ষেত্রে দ্রুত নিয়োগ ও দুর্নীতি রোধে খুবই সহায়ক হবে।